সপ্তম অধ্যায়	কোম্পানির আমলে ভারতের অর্থনীতি

১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (The Famine of 1770)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ১২টি দুর্ভিক্ষ এবং ৪টি বড় আকাল দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ এবং আকালের নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণ থাকে যেমন অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, শিলাবৃষ্টি, শস্যের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সরকারি উদাসীনতা, কৃষকের ওপর করের বোঝা, চূড়ান্ত অবিচারপূর্ণ ভূমি-রাজস্ব নীতি এবং সাধারণ প্রজাবর্গের দারিদ্র্য যা মানুষের দুর্দশাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার সাথে মানুষের নিষ্ঠুরতা যোগ হলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হয় তার অনিবার্য পরিণতি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে (গভর্নর কার্টিয়ারের আমলে) ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। বাংলা সন ১১৭৬-এ এই মন্বন্তর হওয়ার জন্য একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।

প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি কারণে এই দুর্ভিক্ষ হয়। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনাবৃষ্টির কারণে বাংলায় আংশিক শস্যহানি হয়। এরফলে ১৭৬৯ সালের প্রথমদিক থেকেই খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে থাকে। ১৭৭০ সালে খাদ্যাভাব গুরুতর আকার নিলে খাদ্যশস্যের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। যে মিহি চাল টাকা প্রতি ২৮ সের পাওয়া যেত তা টাকা প্রতি ৩ সের হয়। মোটা চালের দামও বেড়ে যায়। কলকাতা কাউন্সিল এই খাদ্যসংকট সম্পর্কে প্রথমে অবহিত ছিল না। সংকটের কথা জানার পর তারা মাদ্রাজ থেকে দুই জাহাজ খাদ্যশস্য চেয়ে পাঠায়। এর মধ্যে শুধু একটি জাহাজে চাল ছিল। খরার জন্য এই সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ফসল নষ্ট হয়। মাঠের পর মাঠ শুকনো পড়ে থাকে। কলকাতা কাউন্সিল দুর্ভিক্ষের এই বিপদ-সংকেত বুঝতে পেরে এক প্রতিবেদনে জানায়, "there is the greatest possibility that this distress will increase and a certainty that it cannot be alleviated for six months to come"। গোটা ১৭৭০ সাল জুড়ে সমগ্র বাংলা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়ে। পূর্ববর্তী ছ'মাস ধরে যে ভয়াবহ খরা দেখা দেয় তাতে মাঠ-ঘাট, খাল, বিল, পুকুর সব শুকিয়ে যায়। এছাড়া এই সময় মাঝে মাঝেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটতে থাকলে হাজার হাজার পরিবারের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। রাজগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ এবং দিনাজপুর ও পুর্নিয়া জেলার শস্যাগারে যে অল্প শস্য মজুত ছিল তা-ও আগুনে ভস্মীভূত হয়। বাংলার গ্রামে গ্রামে মহামারি দেখা দেয়। মুর্শিদাবাদে গুটিবসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়। কিছু স্থানে অনাহার এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে মানুষ মৃতদেহ ভক্ষণ করে বাঁচার

চেষ্টা করে। আবার কিছু জায়গায় মাঠে নতুন ফসল এলেও তার মালিক বলে কেউ থাকে না। সমসাময়িক হিসেব অনুযায়ী জানা যায় যে প্রায় ১ কোটি মানুষ (বা মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ) এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা সব জেলায় একরকম ছিল না। পুর্নিয়া, ভাগলপুর, নদীয়া, হুগলি, বীরভূম, রাজশাহী, পাটনা, যশোরে দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীদের অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় ও অবাধ লুণ্ঠন এবং নায়েব নাজিম রেজা খাঁর দুর্নীতি ও কুশাসনই ছিল এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। দ্বৈতশাসনের ফলে কোম্পানি যে দায়িত্বহীন অবাধ ক্ষমতা পেয়েছিল তারই চরম অপপ্রয়োগ হয় মহম্মদ রেজা খাঁর হাতে। রেজা খাঁর আমিলরা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের তাগিদে কৃষকদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন চালায়। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমিলরা জমির উৎপাদিকা শক্তির সীমা ভুলে গিয়ে সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব দিতে সম্মত ইজারাদারদের নিয়োগ করেন। অতিরিক্ত চড়া হারের ভূমি-রাজস্বের ওপর রেজা খাঁ অন্যায়ভাবে সেস বা উপকর চাপান যা কৃষকদের বহন করার ক্ষমতা ছিল না। একটি উদাহরণ দিলে কোম্পানির কর্মচারীদের কৃষক-শোষণের মাত্রাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আলিবর্দি খানের শাসনকালে পুর্নিয়া জেলা থেকে বছরে ৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হত। কোম্পানির কর্মচারী সুচেতরাম সেই জেলা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেও কোম্পানির কর্মকর্তাদের খুশি করতে পারেননি। এই অতিরিক্ত কর আদায়ের চাপে কৃষকরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে পুর্নিয়ার ২ লক্ষ লোক মারা যায়। পুর্নিয়ার সুপারভাইজার দুকারেল (Ducarel) লেখেন, "the famine continued for about twelve months in a degree of severity hardly to be paralleled in the history of any age or country"। নদীয়া জেলাতেও দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করে। গোটা কৃষকসমাজ ধ্বংস হয়ে গেলে কৃষিকার্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নদীয়ার সুপারভাইজার জানান যে যারা ১২ বিঘার খাজনা দিত তারা ৫ বিঘা চাষ করতেই অপারগ হয়। দুর্ভিক্ষ কবলিত বীরভূম, পাচেত এবং বর্ধমানের উত্তর ও পশ্চিমের শুষ্ক পরগনাগুলিতে ব্যাপক লোকক্ষয় হয়। রাজাকে ভাতা দানের ব্যবস্থা করে রাজস্ব আদায়ের ভার সরকার নিজের হাতে নেয়। পাটনা জেলাতেও দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করেছিল। দুর্ভিক্ষের এই চরম দিনগুলিতে প্রতিদিন পাটনার রাস্তায় অনাহারে ৫০ থেকে ১০০ জন মানুষ মারা গিয়েছিল। এই চরম খাদ্যাভাবের দিনগুলিতেও পাটনা থেকে বেরহামপোর ও কলকাতায় ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য ৮০ হাজার মন চালের যোগান বরাদ্দ ছিল। তাই একথা বলাই বাহুল্য যে কোম্পানির কর্মচারী এবং তাদের প্রতিনিধিদের অনৈতিকভাবে খাদ্যশস্য মজুত করার ফলে খাদ্যসংকট চরমে ওঠে এবং দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাজমহলে দুর্ভিক্ষের পরের বছরও জমিতে অর্ধেক ফসল ফলেনি। শুধু ভাগলপুর শহরেই অর্ধেক লোক মারা যায়। বাংলার অন্যান্য জেলার

তুলনায় হুগলির অবস্থা আরও খারাপ হয়। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সেই জেলাতে রাজস্ব আদায় করার মতো কোনো দায়িত্বশীল লোককে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

যশোহর জেলা মারাত্মক দুর্ভিক্ষের পর বন্যায় প্লাবিত হয়। ফলে স্থানীয় বাসিন্দার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমে যায় এবং চাষবাস ব্যাহত হয়। চব্বিশ পরগনা ও ঢাকা দুর্ভিক্ষ কবলিত হলেও অন্যান্য জেলার মতো দুর্ভিক্ষ এখানে চরম আকার ধারণ করেনি। ঢাকার উঁচু অংশ বা উত্তর পরগনাগুলি খরায় কবলিত হলে শস্যহানি ঘটে। আবার, দক্ষিণ পরগনাগুলি জলে নিমজ্জিত থাকায় ফসল নষ্ট হয়। মেদিনীপুর, মালদা, রংপুর ও দিনাজপুর বাংলার অন্যান্য জেলার মতো কমবেশি দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ শেষ হয়ে গেলেও কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া খুব একটা ব্যাহত হয়নি। দুর্ভিক্ষের সময় সুপারভাইজাররা তাঁদের জেলাগুলি থেকে ৭০ লক্ষ টাকা আদায় করেন। অন্যান্য দেওয়ানি জেলাগুলি থেকে মহম্মদ রেজা খাঁর অধীনস্ত আমিলদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হয়। এর ওপর রেজা খাঁ কৃষকদের ওপর 'নজাই' নামক 'সেস' বা উপকর চাপান যা দুর্ভিক্ষের দিনে শোষণের চরম হাতিয়ার রূপে চিহ্নিত হয়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের ত্রাণের যথাযথ ব্যবস্থা কোম্পানির প্রশাসকরা করেননি। বাংলায় খাদ্যসংকট চরম আকার ধারণ করলেও কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব মুকুব করেনি। ১৭৭০ সালে দুর্ভিক্ষ যখন চরম আকার ধারণ করে তখন মাত্র ৫% ও পরের বছর ১০% রাজস্ব ছাড় দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের দুঃখ ঘোচানোর সরকারি উদ্যোগ ছিল খুবই সীমিত। নায়েব দেওয়ানের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে মুর্শিদাবাদে যে একটি গণ দান গ্রহণের ব্যবস্থা হয় তাতে কোম্পানি ৪০,০০০, নবাব মুবরক-উদ-দৌল্লা ২১,০০০, মহম্মদ রেজা খাঁ ১৫,২৫০, রায়দুর্লভ ৬,০০০ এবং জগৎ শেঠ ৫০০০ টাকা দান করেন। এই দান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল ছিল। এরপর এই উদ্দেশ্যে আরও ৬৫,১৯৩ টাকা ব্যয় করা হয়। হান্টারের হিসেব অনুযায়ী সরকারি ত্রাণের পরিমাণ ছিল ৯০ হাজার টাকা যা বাংলা ও বিহারের তিন কোটি লোকের জন্য খুবই অপ্রতুল ছিল। বাংলা ও বিহারের এই বিপুল জনসংখ্যার প্রতি ১৬ জনে ৬ জন প্রাণ হারিয়েছিল। ১৭৭০ সালে বেশিরভাগ জমিদারই রায়তদের 'তকাভি' ঋণ দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। এই চরম সংকটের দিনেও কোম্পানি সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়াস নিলে বাংলার কৃষকসমাজ তথা বাংলার অর্থনীতির ওপর তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ে। এই অবস্থায় ভূমি-রাজস্ব সম্পূর্ণ মুকুব করলে হয়তো গ্রামবাংলা দুর্ভিক্ষের কবল থেকে তাড়াতাড়ি মুক্ত হত। কিন্তু, কোম্পানির প্রশাসকবর্গ তা করেনি। বাংলার মানুষজন যখন অনাহারে মারা যাচ্ছে তখন সরকার প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্পসংখ্যক লঙ্গরখানা খুলে এবং খাদ্যশস্যের ব্যবসার ওপর নিষ্ফল নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে তার দায়িত্ব সেরেছেন।

কোম্পানি প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে তারা শস্য মজুতের ব্যাপারে ব্যক্তিগত (Private) স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। দরবারের রেসিডেন্ট এবং নায়েব দেওয়ান এই অভিযোগ করেন যে ইংরেজদের গোমস্তারা শস্যের একচেটিয়া কারবার করছে এবং গরীব চাষিদের পরবর্তী মরশুমের জন্য জমানো চাষের বীজ বিক্রি করতে বাধ্য করেছে। এইভাবে রায়তের সর্বনাশ ঘটিয়ে কোম্পানির কর্মচারীরা মুনাফা লুটেছে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয় যে, দুর্ভিক্ষের চরম বিপর্যয়ের দিনগুলিতেও তিনি প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালান। এরফলে নদীয়া, রাজশাহী, পুর্নিয়া, ভাগলপুর প্রভৃতি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জেলাতে চাষের আরও অবনতি হয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে কোম্পানি সরকার ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পাঁচসালা বন্দোবস্তকে গৃহীত নীতি হিসেবে মানতে বাধ্য হয়। এরফলে কোম্পানির ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের কাজ কিছুদিন বন্ধ রাখতে হয় এবং দু'বছর পর এই প্রক্রিয়া আরও হিংসাত্মক ঘটনার জন্ম দেয়। দুর্ভিক্ষের ফলে জমির বাজারদর পড়ে যায়। আবাসিক চাষিদের কাছ থেকে নজাই সেস সংগ্রহ করা হলে তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায়। তাই বাধ্য হয়ে অনাবাসী চাষিদের দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম দরে জমি চাষের চেষ্টা হয়। দুর্ভিক্ষের পরে এই পাইকস্ত (Paikast) চাষিদের সংখ্যাবৃদ্ধি এইভাবে বাংলার কৃষি-জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের ফলে চুরি, ডাকাতি, লুঠতরাজ, রাহাজানি বৃদ্ধি পায়। ফকির ও সন্ন্যাসীরা রংপুর, রাজশাহী, মালদা ও অন্যান্য জেলায় ব্যাপক লুঠতরাজ ও ধ্বংসলীলা চালায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল এই দুর্ভিক্ষে বাংলার চিরাচরিত সামাজিক জীবন ও মূল্যবোধ শুধু আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার গ্রামীণ সামাজিক সংগঠন ভেঙে পড়ে এবং গ্রামে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গলে পরিণত হয়। পুরানো রাজস্ব সংগ্রাহকরা দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং প্রাচীন ভূমি-অভিজাতরা ধ্বংস হয়ে যায়। চাহিদা-যোগানের সূত্র ধরেই দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী সময়ের ভূমি-ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়, রাজস্ব আদায়ের অনিশ্চয়তার জন্য কোম্পানি পাঁচসালা বন্দোবস্তের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে কোম্পানি কানুনগোদের পুরানো নথি ও হিসেবের ওপর আর ভরসা করেনি। পরিচালকগোষ্ঠী প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই নিজেদের ঘাড়ে দায়িত্ব নিয়ে কোম্পানি নতুন করে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু করে। তাই বলা যায়, যেভাবে সিপাহি বিদ্রোহ কোম্পানির শাসন থেকে ব্রিটিশরাজের শাসনে হস্তান্তর ঘটিয়েছিল, ঠিক তেমনভাবেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোম্পানিকে সরাসরি দেওয়ানের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করেছিল।

ভারত থেকে অর্থনৈতিক সম্পদের নির্গমন বা অপহার

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রান্তে ব্রিটিশ শাসনের ফলস্বরূপ প্রতিদানহীন যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও মূল্যবান সম্পদের বহির্গমন ঘটে তাকেই অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক নিষ্ক্রমণ বা Economic Drain আখ্যা দিয়েছেন। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা থেকে নজরানা, উপঢৌকন, পারিতোষিক, উৎকোচ ও ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের আকারে অপরিমিত সম্পদ ও ধনভাণ্ডার দেশে নিয়ে গেলে তাকে "পলাশির লুণ্ঠন" আখ্যা দেওয়া হয়। "পলাশির লুণ্ঠন" বা "Plassey Plunder" কথাটি সর্বপ্রথম ব্রুকস অ্যাডামস (Brooks Adams) নামক গবেষক ব্যবহার করেন। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর রবার্ট ক্লাইভ স্বয়ং বাংলার নবাবদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায়ের পথ দেখান যা পরবর্তী প্রশাসকরা অনুসরণ করেন। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্য কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা এই উপায়ে ৫০ কোটি টাকা দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে "পলাশির লুণ্ঠনের" যে অভিযোগ ওঠে তা ভেরেলেস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো ইংরেজ প্রশাসকরা এবং ইংরেজ চিন্তাবিদ এডমন্ড বার্ক স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ নির্গমনের এই প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্ত অপহার আখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারত থেকে সম্পদ নিষ্কাশন প্রসঙ্গে দাদাভাই নৌরজী তাঁর ১৮৭১ সালে প্রকাশিত প্রখ্যাত গ্রন্থ 'Poverty and Un-British Rule in India'-য় যথার্থভাবেই বলেছেন, "The romance is the beneficence of the British rule and the reality is the bleeding of the British rule"। অর্থাৎ, ব্রিটিশ শাসনের বদান্যতা বা হিতকারী প্রভাব হল রোমান্টিক ভাবনা, আর ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ হল রক্তক্ষরণ। নৌরজী তাঁর এই গ্রন্থে সম্পদ নির্গমনের তথ্যই শুধু দেননি, তিনি একথাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতীয় জনগণের চরম দারিদ্র্য এই নিঃসরণেরই প্রত্যক্ষ ফল। কারণ ভারতীয়রা তাদের সম্পদ নিষ্ক্রমণের বিনিময়ে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে সমমূল্যের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বা বস্তুগত বিনিময়জাত দ্রব্য পায়নি। কার্ল মার্কস স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদ নিষ্কাশন ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক দিক।

ভারত থেকে ইংল্যান্ডে যে পথে সম্পদ নির্গমন হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান হল কোম্পানির প্রশাসক ও কর্মচারীদের দ্বারা উপঢৌকন, পারিতোষিক ও নজরানা আদায়, কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য, ইংরেজ কোম্পানির ভারতে বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্ট, সরাসরি কর আরোপের মাধ্যমে লুণ্ঠন, চীনের আফিম বাণিজ্য, আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি ও বাণিজ্য ঘাটতি, ব্রিটিশ কর্মচারীদের

বেতন, সর্বোপরি সরকারি খরচে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ইত্যাদি। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে বাংলার সিংহাসনে একের পর এক নবাব বসিয়ে কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা বিপুল অর্থ আয় করেন। উপঢৌকন গ্রহণের মাধ্যমে এবং অন্যান্য অবৈধ উপায়ে উপার্জনের ফলে বিপুল অর্থ বাংলা থেকে ইংল্যান্ড চলে যায়। মার্কস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডে দেখিয়েছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬-র মধ্যে শুধু উপহার হিসেবে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড ভারতের বাইরে চলে যায়। মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসানোর বিনিময়ে ভ্যান্সিটার্ট, কলকাতা কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্য ও সেনাদল মোট ৩২,৭৮,০০০ টাকা আদায় করেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নজম-উদ-দৌল্লাকে সিংহাসনে বসিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য ৬২,৫০,০০০ টাকা পেয়েছিলেন। নায়েব নাজিম পদ লাভের জন্য রেজা খাঁ-কে কোম্পানির কর্মচারীদের ৪,৭৬,০০০ টাকা উপঢৌকন দিতে হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসও বেনারসের রাজা চৈত সিং, অযোধ্যার বেগম প্রমুখের কাছ থেকে অনৈতিকভাবে বিপুল অর্থ আদায় করেন। এছাড়া তিনি অবৈধ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তাঁর অনুগামীদের বিপুল অর্থ পাইয়ে দিয়েছিলেন। হেস্টিংস স্বনামে ও বেনামে বহু বেআইনি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা তাঁর ইমপিচমেন্টের সময় প্রকাশ পায়। হেস্টিংসের এই অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চার্লস ব্রান্ট, চার্লস ক্রাফট, সুলিভ্যান প্রমুখ যারা বাঁধ নির্মাণ, আফিম যোগান এবং সামরিক বাহিনীতে মাংস ও অন্যান্য সামগ্রী যোগান দিয়ে বিপুল অর্থ রোজগার করেছিল। ক্লাইভের প্রদর্শিত পথে ফ্রান্সিস সাইকস্ (Francis Sykes) মাত্র দু'বছরে ১২ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন এবং বারওয়েল উপঢৌকন ও অন্যান্য অনৈতিক উপায়ে ৮০ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেন। এইভাবে বিপুল অর্থ ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে তারা "ভারতীয় নবাবের" মতো জীবন কাটাতে থাকেন।

কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমেও বিপুল অর্থ ভারতের বাইরে চলে যায়। ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মন্তব্য করেন যে, উপঢৌকন বাবদ কোম্পানির কর্মচারীরা যত অর্থ পায় তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অবৈধ বাণিজ্যের মাধ্যমে লাভ করে। ব্রিটেনে ফ্রি মার্চেন্ট বলে পরিচিত ব্যক্তিরাও ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। কোম্পানির পরিচালক সভা তাদের ভারতীয় বণিকদের মতোই ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছিল। এছাড়া কোম্পানির এজেন্টরা উৎপাদকদের কাছ থেকে আফিম, রেশম প্রভৃতি পণ্য কেনার সময় তাদের কাছ থেকে সেলামি বা দস্তুরি আদায় করত। উৎপাদকরা পণ্যের দামেরই একাংশ সেলামি হিসেবে দিতে বাধ্য থাকত, কারণ তা না দিলে এজেন্টরা নানা অজুহাতে সেই পণ্য কিনত না। এইভাবে উপঢৌকন, উৎকোচ, বেআইনি চুক্তি, অনৈতিক শোষণ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ কোম্পানির কর্মচারীরা উপার্জন করেছিল তার একটি বড় অংশ দামি রত্ন বা হিরের (diamond) মাধ্যমে দেশে পাঠিয়ে দিত। এরফলে বাংলা থেকে অসং

হিরে ও দামি রত্ন বিলেতে চলে যায়। অনেক ইংরেজ বণিক আবার তাদের উপার্জিত অর্থ কোম্পানির তহবিলে জমা রাখত। পরে দেশে ফিরে পরিচালক সভার কাছে বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ ভাঙিয়ে টাকা তুলে নিত। অনেকে আবার ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাত। বারওয়েলের লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে, তাঁর উপার্জিত ৮০ লক্ষ টাকা তিনি কীভাবে পাঠিয়েছিলেন। কলকাতা, বোম্বাই, জেদ্দা, এলেপ্পো, বেসরা, কায়রো প্রভৃতি বিশ্বের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি টাকা পাঠিয়েছিলেন। বাংলা তথা ভারতে সম্পদ নিষ্কাশনের চাপ বেশি অনুভূত হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের (যেমন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি স্থানে) মতো ইংল্যান্ডের জনগণ ভারতে বসতি স্থাপন করে নতুন মূলধন অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়নি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর যখন ইংরেজদের ভারতে বসবাসের নিয়ন্ত্রণবিধি অনেকটা শিথিল হয় ততদিনে ইংরেজরা অন্যান্য উপনিবেশে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার রেসিডেন্ট জন বেব লিখেছেন, দূরের এক দেশের অধীনে আরেকটি দেশ থেকে এইভাবে ধারাবাহিক সম্পদ নিঃসরণ অধীন দেশেরই ক্ষতি করে।

ইংরেজ কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যে বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে বিপুল অর্থ নিষ্কাশিত হয়। কোম্পানি ভারতের বাজার থেকে পণ্যসামগ্রী (বিশেষত বস্ত্রসামগ্রী ও রেশম) কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত। ভারতের বাজারে ইংরেজ বণিকদের এই কেনাকাটাকে 'ইনভেস্টমেন্ট' বলা হত। এই ইনভেস্টমেন্টের খাতে কোম্পানি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের ৫০ বছরে প্রায় ৬৮ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের দ্রব্য ও প্রায় ২ কোটি পাউন্ড মূল্যের ব্রিটিশ মুদ্রা আমদানি করেছিল। কোম্পানি ভারত থেকে বিভিন্ন রকম পণ্যসামগ্রী কিনলেও তাদের বিক্রি করার মতো কোনো দ্রব্য না থাকায় তাকে ইংল্যান্ড থেকে বুলিয়ন বা সোনা-রূপা দিয়ে এইসব জিনিস কিনতে হত। এরফলে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে সোনা-রূপা আমদানি হত। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এসময় রাজনৈতিক শক্তিরূপে কোম্পানির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সেই সঙ্গে নৃপতিস্রষ্টার ভূমিকা পালনের ফলে প্রচুর অর্থ, উপঢৌকন লাভ ও সবশেষে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে বাংলার রাজস্বের ওপর অধিকার অর্জন কোম্পানিকে বাংলার ধনসম্পদ লুটেপুটে খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এরফলে কোম্পানিকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্য আর ইংল্যান্ড থেকে সোনা-রূপা আমদানি করতে হত না। বাংলার রাজস্ব থেকেই এই ইনভেস্টমেন্টের খরচ বহন করা হত। জেমস মেন্টের হিসেব অনুযায়ী এই ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ ছিল বছরে ১,৮০,০০,০০০ টাকা। ই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরে বাংলায় সোনার আমদানি কমে গিয়েছিল। বরং ১৭৭৭ কে ১৭৮৭ সালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ সোনা কোম্পানির চীন বাণিজ্যে বিনিয়োগের ন্য ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ নিষ্ক্রমণ ছিল

বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্বের উদ্বৃত্ত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা। কোম্পানি তার চীনা বাণিজ্যেও ইংল্যান্ড থেকে মূলধন না এনে বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব দিয়ে চীনের সবুজ চা ও সাদা রেশম ক্রয় করত। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের পর কোম্পানি চীনা বাণিজ্যে বছরে ২৪ লক্ষ টাকা বাংলা থেকে পাঠাত। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় বছরে ২০ লক্ষ টাকা। এরপর বাংলা থেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে আফিম কিনে পাঠানো হত। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর থেকে কলকাতা কাউন্সিল মনে করেছিল তারা এক সমৃদ্ধশালী উর্বরা ভূমি-রাজস্বের চরম শাসক হয়ে বসেছে। বিলেতে পরিচালক সভা এই সময় বেশি অর্থের জন্য চাপ দেয় এবং বেশি বিনিয়োগের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কোম্পানিও এই সময় থেকে ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যকে ইংল্যান্ডে রাজস্ব পাঠাবার এক পথ হিসেবে দেখতে শুরু করে। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০-৭১ সাল পর্যন্ত কোম্পানি বাংলা থেকে ১৩,০৬৬,৭৬১ পাউন্ড রাজস্ব আদায় করে যার প্রায় ৩১ শতাংশ কোম্পানি ভারতে ইনভেস্টমেন্ট খাতে ব্যয় করেছিল। ভেরেলেস্টও স্বীকার করেন যে প্রত্যেক ইউরোপীয় কোম্পানি ভারতের টাকা নিয়ে ভারতেই বিনিয়োগের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব নিয়ে কোম্পানির এই যে বর্ধিত বাণিজ্য এতে দেশীয় শিল্পী, কারিগর ও নির্মাতারা কোনোভাবে লাভবান তো হননি, বরঞ্চ কোম্পানির কর্মচারীদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে চীনে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য লোপ পেলে এবং ইংরেজদের ভারতে বসবাসের ও বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হলে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের চাপ ভারতে অনুভূত হয়। ইংল্যান্ডের মিলে উৎপন্ন পণ্য ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলে। এইভাবে কোম্পানির এই একপেশে বাণিজ্যে ভারতের সম্পদই শুধু নিষ্কাশিত হয়নি, ভারতের শিল্পী-কারিগর শ্রেণীও ধ্বংস হয়েছিল। এছাড়া বোম্বাই ও মাদ্রাজে বারবার সামরিক ও অসামরিক সাহায্য পাঠানো হলে এবং চীন বাণিজ্যে বিনিয়োগ যুক্ত হলে বাংলায় সম্পদ নিষ্ক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

বোম্বাই, মাদ্রাজে যে ব্রিটিশ সাহায্য পাঠানো হত তার অন্যতম কারণ ছিল কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। হায়দার আলি, নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানি-বাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা কোনোভাবেই ভারতীয়দের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। এই যুদ্ধের ব্যয় কোম্পানি ভারতীয় রাজস্ব থেকেই নির্বাহ করেছিল। সুতরাং, এক অর্থে এটাও ছিল সম্পদ নিষ্কাশন। অন্যদিকে চীনা বাণিজ্যের পরিবর্তে বাংলাদেশ কিছুই পায়নি। এই বাণিজ্য ছিল চীন হয়ে ইংল্যান্ডে সম্পদ নিষ্ক্রমণ। কোম্পানি চীন থেকে চা ও সিল্ক কেনার জন্য বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা চীনে পাঠায়। ফলে বাংলায় সোনা-রূপার ঘাটতি দেখা দেয়। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অর্জিত রাজস্বের

১/৭ অংশ আসত চীনাদের কাছে আফিম বিক্রির অর্থ থেকে। এছাড়া ইংরেজ কর্মকর্তারা

সরাসরি করারোপ ও ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতের সম্পদ শুষে নেয়। সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানির প্রশাসকবর্গ ভূমি-রাজস্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রচলিত ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে তারা জমিতে বিভিন্ন রকম মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টি করে যাতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায়। দেওয়ানি লাভের আগে বাংলায় ভূমি-রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৮১৭,০০০ পাউন্ড। ১৭৬৫-৬৬ সালে কোম্পানির নেতৃত্বে সেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১,৪৭০,০০০ পাউন্ড। বাংলা থেকে ক্রমাগত এই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এই ভূমি-রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৩,৪০০,০০০ পাউন্ড করেন। এই বিপুল পরিমাণ করের বোঝা প্রজাবর্গের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে হোমচার্জ বাবদ প্রচুর টাকা ভারত থেকে বিলেতে পাঠাতে হত। এছাড়া প্রশাসন, বিচার ও সামরিক বাহিনীতে উচ্চ বেতনে ইউরোপীয় কর্মচারীদের নিয়োগের ফলে ভারতের রাজকোষে চাপ পড়ে। এইসব উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মীরা তাঁদের বিপুল সরকারি আয়ের বেশিরভাগটাই বিলেতে পাঠিয়ে দিত। ফলে বাংলার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে।

পলাশির যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ থেকে কী পরিমাণ সম্পদ নিষ্কাশিত হয়েছিল তার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা মুশকিল, কারণ প্রতি বছরের জন্য নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান মেলেনি। ভেরেলেস্টের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী দেওয়ানি লাভের পরবর্তী পাঁচ বছরে ৪৯,৪১,৬১১ মিলিয়ন স্টার্লিং পরিমাণ সম্পদ দেশের বাইরে চলে যায়। উইলিয়াম ডিগবি-র হিসেব অনুযায়ী ১৭৫৭ সাল থেকে ওয়াটারলু যুদ্ধের (১৮১৫) সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত থেকে নিষ্কাশিত সম্পদের পরিমাণ ৫০ কোটি পাউন্ড থেকে ১০০ কোটি পাউন্ডের মাঝামাঝি কোনো অঙ্কের সমান ছিল। দাদাভাই নৌরজীর মতে, ১৭৮৮-৮৯ সাল থেকে ১৮২৮-২৯-এর মধ্যে ভারত থেকে নিঃসারিত সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি পাউন্ড। জে.সি. সিংহের মতে, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০-র মধ্যে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে মোট ৩৮,৪০০,০০০ পাউন্ড সম্পদ নিষ্কাশিত হয়েছিল। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের আমদানি-রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে হোল্ডেন ফারবার সম্পদ নিষ্কাশনের পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তিনি সম্পদ নিষ্কাশনের সঠিক হিসেব নির্ধারণের জন্য ওলন্দাজ ও দিনেমারদের হুন্ডি বিশ্লেষণ করেছেন। ফারবারের মতে, ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ পাউন্ড সম্পদ নিষ্কাশিত হয়। এই সম্পদ নির্গমনের প্রধান ধাক্কা বাংলার উপরেই এসেছিল। কারণ মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ প্রশাসন পরিচালনার যে ব্যয় ছিল সে তুলনায় আয় ছিল কম। সুতরাং, সম্পদ নিষ্ক্রমণের চাপ সেখানে বিশেষ অনুভূত হয়নি। অবশ্য বুলিয়নের প্রত্যক্ষ রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদ নিষ্ক্রমণ হয়েছিল কি না তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। গুলাম হোসেন ও মন্টগোমারী মার্টিনের মতো লেখকেরা দেখাতে চেয়েছেন

যে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে বুলিয়ন অথবা মুদ্রা রপ্তানি হত। মন্টগোমারী মার্টিন (Montgomery Martin)-এর মতে, ভারত থেকে ইংল্যান্ডে বছরে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদ নিষ্কাশিত হত। ওয়ারেন হেস্টিংস এবং জন শোরের মতো ব্রিটিশ প্রশাসকরা এ কথা স্বীকার করেছেন। তবে জে.সি. সিংহ ও হ্যামিলটনের মতে, বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ বুলিয়ন ইংল্যান্ডে রপ্তানি হত, একথা ঠিক নয়। অন্যদিকে হোল্ডেন ফারবার মনে করেন, ইউরোপে প্রত্যক্ষ বুলিয়ন রপ্তানি এত কম ছিল না যে তাকে উপেক্ষা করা যায়। ১৭৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ১.৭৮ মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদ নিঃসারিত হয়েছিল।

একতরফা ভারতীয় সম্পদ নিষ্ক্রমণ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী নেতাদের উদ্বেগ ধরা পড়ে তাঁদের রচনায়। নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের এই উদ্বেগই ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। দাদাভাই নৌরজী ও রমেশচন্দ্র দত্ত যথাক্রমে তাদের 'Poverty and Un-British Rule in India' এবং 'Economic History of India' Vol I & II গ্রন্থে সম্পদ নিষ্ক্রমণ তত্ত্বটিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সমালোচনার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে দাঁড় করান। তাঁদের বিশ্লেষণে ১৮৫৮-এর পরবর্তী যুগের সম্পদ নিষ্ক্রমণই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁরা মূলত ভারতবর্ষে কোম্পানির বিনিয়োগ, কোম্পানির অংশীদারদের লভ্যাংশে দেওয়া জাতীয় ঋণ ও কর্মচারীদের অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণকে সম্পদ নির্গমনের মধ্যে ধরেছেন। এই জাতীয়তাবাদী লেখকেরা সম্পদ নির্গমনকে ভারতবর্ষের দরিদ্রতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই উনবিংশ শতকের শেষপর্বে সম্পদ নির্গমন তত্ত্বটি রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে। ব্রিটিশ সরকারের শোষক রূপটি তারা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক থিওডর মরিসন তাঁর 'The Economic Transition in India' গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেওয়া সম্পদ নির্গমন তত্ত্বটিতে অতিরঞ্জন রয়েছে। পি.জে. মার্শালও প্রায় একই সুরে বলেন যে বাংলা থেকে অপহার বা সম্পদ নির্গমনের প্রক্রিয়া একতরফা হয়নি। মরিসনের পক্ষ নিয়ে এল.সি.এ. নল্‌স (L.C.A. Knowles) ও ভেরা অ্যানস্টি (Vera Ansty) সম্পদ নিষ্ক্রমণ তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন। তাঁরা একে একতরফা সম্পদ নিঃসারণ বলে মেনে নিতে নারাজ। তাঁদের মতে, জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেওয়া আমদানি-রপ্তানির তালিকায় 'শিপিং সার্ভিস', 'ইনসিওরেন্স চার্য'-এর মতো অদৃশ্য আমদানিকে হিসেবের তালিকায় ধরা হয়নি। মরিসনের মতে, বাৎসরিক সম্পদ নিঃসারণ ২১ মিলিয়ন স্টার্লিং-এর বেশি হয়নি। তিনি যুক্তি দেখান যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থেকে ইংরেজদের যে লাভ হয়েছিল তার বিনিময়ে ভারতীয়রাও তাদের দেশের আর্থিক বিকাশের জন্য বিদেশি মুদ্রার সাহায্য পেয়েছিল। রেলওয়ে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে, কারিগরি কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্রিটিশ

অধ্যাপকদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। একথা ঠিক যে এই সময়ের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া জটিল, কিন্তু যে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদ নিষ্ক্রমণ হয়েছিল এবং তার ফলে তার চাপ ভারতীয় অর্থনীতিতে গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল।

অবশিল্পায়ন (Deindustrialization)

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ধ্বংসাত্মক দিক হল দেশীয় হস্তশিল্প ও কারিগর শ্রেণীর ধ্বংসসাধন। অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষে ব্যাপক শিল্পায়নের সম্ভাবনা না থাকলেও একটি উন্নত শিল্প-ব্যবস্থা (বিশেষত বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে) যে ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ নেই। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজরা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে লাগল, তখন থেকেই বাণিজ্যধারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং ভারতীয় হস্তশিল্পের ওপর তার প্রভাব পড়তে থাকে। অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের কদর ছিল বিশ্বব্যাপী। ইউরোপের বাজারে ঢাকার মসলিন, মিহি সুতিবস্ত্র ও রেশম বস্ত্রের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। ইংরেজ কোম্পানি বাংলা ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে এইসব পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে ইউরোপে বিক্রি করত। এই যুগে বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির একটি বড় কারণ ছিল তার সম্প্রসারণশীল বৈদেশিক বাণিজ্য। সারা ভারত ও বহির্বিশ্বের বাজারে বাংলার শিল্পজাত পণ্যের এত সুখ্যাতি ছিল যে এর বিনিময়ে প্রতিবছর বাংলায় প্রচুর সোনা আমদানি হত। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার রপ্তানিযোগ্য বিলাসসামগ্রীর চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায়নি। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ কর্মচারীরা নবাবের কর্মচারীদের ভ্রুক্ষেপ না করে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেচ্ছাচার করতে থাকে। দেশীয় তাঁতি ও কৃষকদের ওপর ইচ্ছেমতো শর্ত চাপিয়ে দিয়ে এদের কাছ থেকে পণ্যসামগ্রী আদায় করতে থাকে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজ বণিকেরা বাংলার রাজস্বের টাকা দিয়ে সাদা ক্যালিকো ও মিহি মসলিন বস্ত্র কিনে তা ইংল্যান্ডের বাজারে অনেক বেশি দামে বিক্রি করত। ইংরেজ বণিকদের এই বাণিজ্যশুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করা দেখে দেশীয় বণিকেরাও সেই সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করত। তারা ইংরেজ বণিকদের তাঁবেদার হয়ে কাজ করতে থাকে। কোম্পানির কর্মচারী ও দেশীয় এজেন্ট বা গোমস্তার মাধ্যমে কোম্পানি তাঁতিদের দাদন বা অগ্রিম দিত। পরে এই অগ্রিম অর্থের বিনিময়ে তাঁতিদের কম দামে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে বাধ্য করত। তাঁতিরা একমাত্র কোম্পানির বরাদ্দ করা কাপড় উৎপাদন করতে বাধ্য থাকত। বাংলার বাইরের ক্রেতারা কোম্পানির খবরদারির ফলে বাংলার কাপড় কেনা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এইভাবে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উত্তর ভারতীয় ও ইউরোপের অন্যান্য কোম্পানিগুলিকে হটিয়ে বাংলায়

একচেটিয়া বাণিজ্য কায়েম করে। লাভের অঙ্ক বাড়াবার জন্য কোম্পানির কর্মচারীরা তাঁতিদের চড়া দামে তুলো কিনতে বাধ্য করে। এইভাবে চড়া দামে তুলো কিনে কম দামে কাপড় বিক্রি করতে বাধ্য হলে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের ওপর চরম আঘাত নেমে আসে। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হলে কোম্পানির বাণিজ্য ও শিল্পনীতিতে আরও পরিবর্তন আসে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থে যে অর্থনীতি অনুসরণ করা হয় তার ফলে ভারত ইংল্যান্ডের কলকারখানায় তৈরি শিল্প-পণ্যের বাজারে পরিণত হয়। ভারতের দেশীয় শিল্পের বিনাশ ঘটে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থে দেশীয় শিল্পের এই বলিদানকেই অবশিল্পায়ন (Deindustrialization) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, উনবিংশ শতকে ভারতের শিল্পজাত পণ্যের পরিবর্তে কৃষিজাত কাঁচামাল ব্রিটেনে রপ্তানি করা এবং ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্য ভারতে আমদানি করার ফলে ভারতীয় হস্তশিল্পের যে বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল তাকে অবশিল্পায়ন (deindustrialisation) বলা হয়ে থাকে।

অনেকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সাময়িক বিপর্যয়কে অবশিল্পায়নের কারণ হিসেবে দেখাতে চাইলেও তা অবশিল্পায়নের যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। অবশিল্পায়নের প্রকৃত কারণ হল ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লব এবং তদ্‌জনিত ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্য নীতি। ইংল্যান্ডে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুসমন্বয়ে গড়ে ওঠা আধুনিক কলকারখানার মাধ্যমে যে ব্যাপক শিল্প উৎপাদন শুরু হয়, ভারতকে সেই শিল্পসামগ্রীর বাজার হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কোম্পানির ডিরেক্টরদের ওপর চাপ আসতে শুরু করে বাংলার সুতিবস্ত্রের আমদানি বন্ধের জন্য। কোম্পানির পরিচালনগোষ্ঠী বুঝতে পারেন যে মাঝারি ও মোটা ধরনের কাপড় আর ভারত থেকে রপ্তানি করা লাভজনক নয়। বস্ত্রের জায়গায় রপ্তানিপণ্য হিসেবে কাঁচা তুলো, রেশম, চিনি, নীল, তামাক, চা ইত্যাদি ইংল্যান্ডে পাঠানো শুরু হয়। ইংল্যান্ডের পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদন ভারতের বাজারে বিক্রির জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে থাকেন। এরফলে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটে এবং ভারতের বাজারে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটে। অর্থনীতিবিদ রমেশচন্দ্র দত্ত তাই মনে করেন, ইউরোপে পাওয়ার লুমের আবিষ্কার ভারতীয় শিল্পের বিনাশকে সম্পূর্ণ করেছিল ("The invention of power loom in Europe completed the decline of the Indian industries.")। এরসঙ্গে যুক্ত হয় ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি। ইংল্যান্ডের শিল্প-সামগ্রীকে রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতের বাজারকে ব্যবহার করে এবং ভারতের দেশীয় শিল্পী কারিগররা যাতে এই বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পারে তার জন্য ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত মিলের কাপড়ের ওপর শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হয়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে আইন করে ব্রিটিশ সরকার বিলেতের শিল্পজাত পণ্যের ওপর

মাত্র $২\frac{১}{২}\%$ শুল্ক ধার্য করে। অথচ ১৭৯৭ সালের আগে যে মসলিন ও কালিকোর ওপর ১৮% শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল, ১৮০০ সালে তা বাড়িয়ে করা হয় ৩০%। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে এই হার আরও বেড়ে হয় $৩১\frac{১}{২}\%$। অন্যদিকে সাদা ক্যালিকোর ওপর ১৭৯৭ সালের আগে ধার্য শুল্কের হার ছিল ৪০%। পরে তা ধাপে ধাপে (১৮০০ ও ১৮২৩ খ্রিঃ) বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০% এবং ৬৭½%। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যাপক শুল্ক বৈষম্যের অসম বাণিজ্যে ভারতীয় বণিক ও কারিগরদের পেরে ওঠা সম্ভব ছিল না। তাই ভারতীয় শিল্পের বিনাশসাধনই ছিল এই বৈষম্যমূলক নীতির অনিবার্য পরিণতি। রমেশচন্দ্র দত্তের মতো জাতীয়তাবাদী লেখকেরা তাই বিশ্বাস করেন যে, ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হলে তার এই পরিণতি হত না, কেন-না স্বাধীন দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় তৎপর হত। কিন্তু ভারত বিদেশি শক্তির পদানত হওয়ায় ইংল্যান্ডের শিল্পস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের দেশের শিল্পের বিনাশ দেখেছিল। ভারতে ইংরেজ শক্তির রাজনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতীয় কারিগর ও বণিকদের দেশীয় বাজারও হাতছাড়া হতে থাকে। ইংরেজদের হাতে পরাজিত দেশীয় রাজা, নবাব, আমির ওমরাহ ও তাদের পরিবারবর্গ একসময় বহু মূল্যের রাজপোষাক এবং সূক্ষ্ম ও রুচিসম্মত পোষাক ও বিলাসসামগ্রী ব্যবহার করতেন। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তাঁরা তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা হারান। এরফলে দেশীয় শিল্পী কারিগরদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও সংকুচিত হয়ে আসে এবং তারা বেকার হয়ে পড়েন।

অবশিল্পায়ন ভারতে আদৌ ঘটেছিল কি না বা ঘটে থাকলে তা ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে কতটা ক্ষতিকারক ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক যুগের জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদগণ যেমন রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, মদনমোহন মালব্য এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ডি.আর. গ্যাডগিল ('The Industrial Evolution of India in Recent Times'), মেজর ডি.ডি. বসু ('Ruin of Indian Trade and Industries'), সারদা রাজ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মনে করেন, ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যয় ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল থর্নার এবং মার্কিন পণ্ডিত মরিস-ডি-মরিস উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ভারতে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ১৭৬০ থেকে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় কর্মরত উইলিয়াম বোল্টস (William Bolts) তাঁর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Considerations on Indian Affairs' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে দেশের দরিদ্র নির্মাতা ও কারিগরদের ওপর অকল্পনীয় অত্যাচার

ও কঠোরতা চালানো হচ্ছে যারা বস্তুত কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্যের দ্বারা দাসের মতো শৃঙ্খলিত ("Inconceivable oppression and hardships have been practised towards the poor manufacturers and workmen of the country, who are, infact, monopolised by the Company as so many slaves.")। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির চার্টার পুনর্নবীকরণের সময় এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ভারতীয় শিল্পের মূল্যেই ব্রিটিশ শিল্পের উন্নতি পার্লামেন্ট করতে চায়। এই চার্টার আইন অনুযায়ী কোম্পানির একচেটিয়া কারবার উঠে গেলে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্য ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলে। ১৭৯৫ সালে বাংলা থেকে ইউরোপে ৪৭,৩২,৫৪৫ সিক্কা টাকার পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করা হয় যা ১৭৯৭ সালে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৮,৫৮,২৩৫ টাকায়। বাংলা থেকে রপ্তানি পণ্যের (সুতিবস্ত্রের) এই ক্রমহ্রাসমান ধারা বজায় থাকে। যেমন, ১৭৯৭-৯৮ সালে ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা বস্ত্রের মূল্য ছিল ৭৯,০৮,৬৮৮ টাকা এবং ১৮০৮-০৯ সালে তা আরও কমে দাঁড়ায় ৫৭,৪০,৪৫৫ টাকায়। ওয়েলেস্‌লি রোহিনখণ্ড ও হরিদ্বারে শিল্প প্রদর্শনী করে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ভারতীয় বস্ত্র যাতে ইংল্যান্ডে ঢুকতে না পারে সেজন্য ক্যালিকো ও মসলিনের ওপর উচ্চহারে শুল্ক বসানো হয়েছিল। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের মিলে তৈরি সস্তা কাপড় আরও সুলভ করার জন্য তার ওপর মাত্র $২\frac{১}{২}\%$ হারে শুল্ক ধার্য করা হল। এইভাবে ভারতের বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়।

জাতীয়তাবাদী লেখকেরা সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করে তাঁদের জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। ১৮৬০ সালে বিলেত থেকে ভারতে সুতিবস্ত্রের আমদানি যেখানে ছিল ৯৬ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং, তা ১৮৮০ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড। কুড়ি বছর পর অর্থাৎ ১৯০০ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২৭ কোটি পাউন্ড। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, বিদেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধির অর্থ হল দেশীয় শিল্প দেশের ও বিদেশের বাজার হারাল। এরফলে বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শিল্পী, কারিগর, শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। অনেকে বাধ্য হয়ে চাষ-আবাদ শুরু করে। এরফলে জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি পেল, অথচ সমানুপাতিক হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেল না। ভারতের কৃষককুল স্বাধীনতা হারিয়ে সেইসব দ্রব্য উৎপাদন করতে বাধ্য হল যা ইংল্যান্ডের শিল্পের উপযোগী ছিল। এরসঙ্গে দাদনি ব্যবস্থা যুক্ত হলে ভারতীয় শিল্পের পতন অনিবার্য হয়। এন.কে. সিংহ মনে করেন যে ইংরেজ কোম্পানি গায়ের জোর খাটিয়ে তাঁতিদের একচেটিয়া ব্যবসার ফাঁদে ফেলেছিল। ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে ভারতবর্ষের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্রগুলি ও বন্দরগুলি ধীরে ধীরে অবশিল্পায়নের চাপে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। সুরাট, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পাটনা, বারাণসী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহর ও বন্দর ক্রমশ শুধু তার প্রাধান্যই হারায়নি, অস্তিত্বও বিপন্ন হয়েছিল। ১৮১৮ সালে ঢাকা এবং

১৮১৯ সালে শান্তিপুর ও পটনার কুঠি উঠে যায়। বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাঁতি, সুতো কাটুনি, ধুনুরি, রঞ্জক, সূচি শিল্পী ও অন্যান্য কারিগর শ্রেণী বেকার হয়ে পড়লে শহরের জনসংখ্যা হ্রাস পায়। ১৮০০ সালে যে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল দু'লক্ষের ওপর, ১৮৩৯ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬৮০৩৮ জনে। কর্মহীন কারিগর শ্রেণী গ্রামে এসে ভীড় করে নতুন জীবিকার সন্ধানে। এর পাশাপাশি কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই-এর মতো শহর তৈরি হল বটে কিন্তু তা পুরোপুরি ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকে তোষণ করার জন্য। ভারতে দেশীয় শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজারও বৈষম্যমূলক শুল্কনীতির জন্য বিনষ্ট হয়েছিল। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের নবম আইনের ৩০ নম্বর ধারায় যে নতুন শুল্কনীতি চালু হয়েছিল তা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে শুভ হয়নি। মুঘল যুগে অভ্যন্তরীণ শুল্কের চেয়ে টোলের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি যা দূরত্ব অনুযায়ী ছোট ছোট কিস্তিতে আদায় করা হত। কিন্তু নতুন নিয়মে সবচেয়ে বেশি দূরত্বের ভিত্তিতে শুল্ক আদায় করা হলে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ঘটেছিল একটি সুনির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে, ব্রিটিশ রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে।

মার্কিন পণ্ডিত মরিস ডি মরিস ভারতের জাতীয়তাবাদী লেখকদের অবশিল্পায়নের তত্ত্ব মানতে নারাজ। তাঁর মতে, "অবশিল্পায়ন" বিষয়টি কল্পকাহিনী বা 'myth' ছাড়া কিছু নয়। তিনি মনে করেন ঔপনিবেশিক শাসনে অবশিল্পায়ন ঘটেনি। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা শিল্পজাত পণ্যের আমদানি বৃদ্ধিকেই অবশিল্পায়ন আখ্যা দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দেখান, যদি জনসংখ্যা এবং জাতীয় আয় বাড়ে তবে দেশীয় শিল্প অক্ষত রেখে আমদানি বৃদ্ধি সম্ভব। তিনি মনে করেন, ভারতে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশি ও বিদেশি উভয়প্রকার উৎপাদনই বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং, ভারতে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে না এবং ভারতের দেশীয় শিল্প ধ্বংসের অবকাশ নেই। তাছাড়া বিলেতের শিল্পসামগ্রীর আমদানির ফলে কিছু ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্যত্র দেশীয় শিল্পের বিকাশ সম্ভব। যেমন তিনি বলেন যে আমদানি করা সুতো সস্তা হবার দরুন দেশীয় তাঁতিরা লাভবান হয়েছিল। সর্বোপরি কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর নিজস্ব বাজার ছিল। মরিসের বিশ্লেষণে যুক্তি ও পরিসংখ্যানের অভাবের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হয়েছে। ইরফান হাবিব ও বিপান চন্দ্র মরিসের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই সিদ্ধান্তের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। রমেশচন্দ্র দত্ত ও পরবর্তীকালে আর.পি. দত্ত (R.P. Dutt) বিপুল তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ১৭৬৫-১৮১৩—এই পর্বে ব্রিটিশ সরকার সচেতনভাবে অবশিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করেছিল। জাপানি ঐতিহাসিক তরু মাৎসুই মরিসের যুক্তি খণ্ডন করে দেখান যে উনবিংশ শতকে তাঁতিদের সংখ্যা যেমন কমে যায়, তাদের আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। তরু মাৎসুই ও বিপান চন্দ্র দেখান, যে পরিমাণ সুতো আমদানি করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তৈরি কাপড় এদেশে এসেছিল। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী

বিলেতি যন্ত্রশিল্পের কাছে ভারতীয় হস্তশিল্পের পরাজয়কে অনিবার্য পরিণতি হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ভার ভারতকে বইতে হবে কেন? ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতের অবশ্য এছাড়া গত্যন্তর ছিল না, তাই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কুফল তাকে ভোগ করতেই হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্পবিপ্লব কুটির শিল্পকে ধ্বংস করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেখানে এই ধ্বংসের পাশাপাশি যে দ্রুত শিল্পায়ন হয়েছিল তাতে অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। ভেরা অ্যানস্টি-র মতো ব্রিটিশ লেখিকারা ভারতের এই অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়াকে "Arrested development" বলে আখ্যা দিয়েছেন।

তবে ভারতের সর্বত্র একই সঙ্গে অবশিল্পায়ন ঘটেনি। রেল যোগাযোগ-সম্পন্ন এলাকায় যেমন অবশিল্পায়ন আগে ঘটে, তেমনি রাজস্থানে অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া দেরিতে শুরু হলেও সেখানে শিল্পের পতন সূচিত হয়নি। গ্রামাঞ্চলের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কম হওয়ার দরুন তারা সস্তা দামের খাদির কাপড় ব্যবহার করতেন। তাই সেখানে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়নি। ড্যানিয়েল থর্নার (Daniel Thorner) অবশিল্পায়নের তত্ত্বটি বিচার করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে আদমশুমারির দ্বারা প্রমাণিত, শিল্পকর্ম ও কৃষিকাজে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা অবশিল্পায়নের বিরুদ্ধে। থর্নারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি হল যে তিনি যে সময়ের ওপর গবেষণা করেছেন (১৮১৮-১৯৩১) অবশিল্পায়ন ঘটেছিল তার অনেক আগে, ১৮০০-১৮৬৫-র মধ্যবর্তীকালে। অবশ্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের ক্ষতি কিছুটা পূরণ হয়েছিল কাঁচা রেশম, চিনি ও নীল চাষের ফলে। কাঁচামালের উৎপাদন ও রপ্তানিও বৃদ্ধি পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু তা সবই ঘটেছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থ পূরণের জন্য। এর দ্বারা ভারতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। তাই ভারতের দেশীয় শিল্পের মূল্যেই যে ব্রিটেনের শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে, একথা প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবেই থেকে যায়।